দীপালির দিনলিপি

বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

স্মৃতি কি সততই সুখের? বলা শক্ত। তবে স্মৃতিচারণার মধ্যে কোথাও একটা ভালোলাগা বোধ থেকে যায়। সে ঘটনা আনন্দ বা দুঃখের, যাই হোক না কেন। তা কি পুরনো, অনেককাল আগে ঘটে গেছে বলে? একেই কি বলে নস্টালজিয়া?

আনন্দজনক ঘটনার স্মৃতিচারণাতে তো খুশি লাগেই। দুঃখের স্মৃতি পুরনো হয়ে গেলেও, তাতে আর সেই সমকালের কষ্টের তীব্রতা থাকে না। তা থাকলে হাজার-হাজার দুর্ঘটনার স্মৃতি নিয়ে, কত শত প্রিয়জনকে হারিয়েও মানুষ বছরের পর বছর বেঁচে থাকে কী করে?

স্কুল পেরিয়ে কলেজে এসে প্রায় সবাই বলে, স্কুল-লাইফটাই ছিল ভালো। তা কি স্রেফ পুরনো বা স্মৃতি হয়ে গেছে বলে? ফেলে আসা দিনগুলোকে আর ফিরে পাবো না জেনে?

বর্তমান নিয়ে সুখী না থাকাটাই কি মানুষের একটা সাধারণ অভ্যেস? ভবিষ্যৎ জানা নেই। তাই হয়তো অতীত স্মৃতিচারণায় সবসময় একটা অন্যরকম আনন্দ কাজ করে যায়, আমাদের মনের ভেতরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়া হয়নি। তাহলে তখন কি বলতাম, কলেজ-লাইফটাই ছিল ভালো? আমার অবশ্য স্কুল নয়, কলেজ-জীবনের কথাই বেশি করে মনে পড়ে। আর কলেজ মানেই আমাদের বাংলার হেড রুদ্র সেন। আর. এস.।

জীবনে একবারই কলকাতায় গিয়ে একটা নাটক দেখেছিলাম আমি। আমি মানে আমরা। কলেজ থেকে। কলেজের বন্ধুরা মিলে। রবীন্দ্রসদনে। 'নাথবতী অনাথবৎ'। নাটকটা আমাদের দেখে আসতে বলেছিলেন আর. এস.।

শাঁওলী মিত্রের সেটাই বোধহয় প্রথম নাটক ছিল। সেই নাটকে গ্রাম্যবধূর কথকতায়, বিবাহিতা সীতা কেঁদে-কেঁদে গেয়েছিল একটা গান। আজও বেশ মনে আছে।

'সুখে ছিনু, যবে ছিনু, জনকতনয়া।'

ধ্রুবর জন্যই নাটকটা দেখা সম্ভব হয়েছিল আমাদের। ও গিয়ে সকাল থেকে লাইনে না দাঁড়ালে,অতগুলো টিকিট পাওয়াই যেত না।

কলেজে সেবার নবীন-বরণে উৎপলেন্দুকে আনা হয়েছিল। নির্মলেন্দু চৌধুরীর ছেলে। নির্মলেন্দু বলতেই সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' সিনেমার গানের কথা মনে পড়ে।

'আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে...'; 'ইচ্ছে করে পরাণডারে গামছা দিয়া বান্ধি।'

পুরনো লোকেরা বলেন, বাবার কিছুই নাকি ছেলে পায় নি। গানের অতশত তখন কী-ই বা বুঝি আমরা? মনে আছে, উৎপলেন্দুর

'সোহাগ চাঁদ-বদনি ধনি, নাচো তো দেখি
নাচো তো দেখি বালা, নাচো তো দেখি'

গাওয়ার সময় ধ্রুবর বন্ধুদের কয়েকজন কোমর দুলিয়ে নেচেছিল। ধ্রুব অবশ্য নাচে নি। নাচা, নাচানো কোনো ক্ষমতাই ছিল না ছেলেটার। খালি চেহারাটাই দ্যাখ্‌নাই।

সেই নাচানাচি নিয়ে জোর আপত্তি তুলেছিল ছাত্র-সংসদের এস. এফ. আই এর ছেলেরা। এস. এফ. আই. আর সি. পি.-র ছেলেদের মধ্যে তা নিয়ে কী সব গন্ডগোলও হয়েছিল।

আমার তো বেশ ভালোই লেগেছিল,উৎপলেন্দুর গাওয়া শেষ গানটা। আজও স্পষ্ট মনে আছে তার প্রথম লাইনটা—

'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।'

এও কি সেই পুরনোর প্রতিই টান নয়? অতীতে ফেরা। নস্টালজিয়া হয়তো।

ধ্রুব আমার খুব ছোটোবেলার বন্ধু ছিল। বন্ধু ঠিক নয়, প্রতিবেশী। মাঝে দীর্ঘকাল ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। কলেজে এসে আবার দেখা। ফাস্ট ইয়ারে। সালটা ছিল ১৯৯১। তবে ঐ দেখা মাত্র; তার বেশি কিছু নয়।

ধ্রুব, আমি, আমরা সবাই কলেজে আর. এসের ভয়ঙ্কর ফ্যানস্ ছিলাম। দুর্দান্ত পড়াতেন তিনি। একেবারে অন্যরকম। অন্য স্বাদ। জীবনমুখী পড়ানো বোধ হয় তাকেই বলে। ওঁর পড়ানোতে ফিদা ছিল সকলেই।

ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির, অসম্ভব রাগী স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। বাইরে থেকে দেখলে প্রচণ্ড দাম্ভিক মনে হ'ত। কিন্তু মিশলে বোঝা যেত, মানুষ হিসেবে অসম্ভব নরম, অনুভূতিশীল আর স্পর্শকাতর ছিলেন আর. এস.। ওঁর মতো পরোপকারী, ছাত্রদরদি শিক্ষক খুব কম দেখা যায়। কত ছাত্রছাত্রীর লাইফ যে উনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন!

লোকটার দায়িত্ববোধ, সময়জ্ঞান ছিলো দেখার মতো। ওঁকে দেখে আমরা ঘড়ির সময় মেলাতাম। পানচুয়ালিটি, সিনসিয়ারিটি কী বস্তু, তা আর. এস.-কে না দেখলে বোঝানো যাবে না।

দাপটের সঙ্গে কলেজ কাঁপিয়ে পড়াতেন তিনি। তবে স্যারের মুখের বাইরের ভাষাটা ছিল বড্ড রাফ; মিষ্টির কণামাত্রও থাকত না তাতে। ছেলেমেয়েরা ভয়ও পেত ওকে যমের মতো। আবার পাগলের মতো ভালোওবাসত।

যথেষ্ট হ্যান্ডসাম হলেও রূপের দিক থেকে আর. এস-কে ঠিক তথাকথিত সুন্দর বলা চলে না। তবে চাপা রঙে অসম্ভব সুন্দর চোখ আর প্রবল ব্যক্তিত্বে মানুষটা খুব আকর্ষক ছিলেন।

ফাটাফাটি রকমের স্মার্টও ছিলেন আর. এস.। একেবারে ঝাঁ-চক্‌চকে। ওঁকে দেখে আমরা কেউ বলতাম চাবুক। কেউ বলত খোলা তলোয়ার। সত্যিকারের একটা জ্যান্ত মানুষ। অসম্ভব প্রাণবন্ত। চল্লিশ পেরিয়েও অত প্রাণশক্তি লোকটা কোথায় পেত, কে জানে!

অ্যাট্রাকটিভ পার্সোনালিটি বোধ হয় তাকেই বলে। লোকটার চোখে, কথায়, হাঁটায়, সব তাতেই আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতাম একটা দুরন্ত চৌম্বক শক্তির।

প্রতি বছর যে কত অনুরোধ-উপরোধ নিয়ে ওঁর কাছে সবাই প্রাইভেট টিউশন পড়ার জন্য ছুটত! কিন্তু যথেষ্ট আর্থিক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও, কখনও প্রাইভেট টিউশনের পথে যান নি আর. এস.। অর্থ ব্যাপারে আজকের দিনেও এমন নির্লোভ, আদর্শবাদী শিক্ষক কমই চোখে পড়ে।

ওঁর মতো জনপ্রিয় শিক্ষক টিউশন করলে, অনায়াসে বাড়ি-গাড়ি, কি না করতে পারতেন! কিন্তু সে পথ মাড়াননি স্যার। গ্রামের দিকে একটা ভাঙাচোরা ছোট্ট পুরনো বাড়ি কিনে, সেখানেই রীতিমতো কষ্ট করে বাস করতেন তিনি।

স্যারের মত ছিল, যাদের কলেজে পড়ানোর জন্য সরকার মাসিক ভালোই মাইনে দিচ্ছে, সেই ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে এনে পড়িয়ে আবার টাকা নেওয়াটা ঘোরতর অন্যায়।

উনি বলতেন, ক্লাসে আমরা সবাই যদি ঠিকমতো পড়াই, তবে ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা করে আমাদের বাড়িতে এসে টাকা দিয়ে পড়তে হবে কেন?

— তাহলে নিশ্চয় ক্লাসে আমরা ফাঁকি মারছি। কম দিচ্ছি? ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করছি না আদৌ। এবং সেটা সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই। যাতে তারা দলে-দলে আসে আমার বাড়িতে পড়তে।

কথায় কথায় আর. এস. ব্যস্তানুপাতের অঙ্কের কথাটা খুব বলতেন। একটা বাড়লে অন্যটা কমে। ক্লাসে কম দিলে, তবেই আমার ঘরের মাদুর ভরে যাবে কলেজের অসংখ্য খদ্দেরে। তা হলে মাসিক মাইনের নিশ্চিত নিরাপদ জায়গাটাতে চূড়ান্ত ফাঁকি মেরে, নিজের ঘরটা সহজেই ভরিয়ে তোলা যায় উপরি-আয়ে। আর সেটা করছি, আমার কর্মস্থল কলেজের চাকরিটাকে ভাঙিয়ে ও বঞ্চিত করেই।

আর. এস. ক্লাসে নিয়মিত পড়া ধরতেন। ক্লাসের মধ্যেই পড়া তৈরি করিয়ে দিতেন তিনি। ওঁর বিষয়টা আমাদের কাউকে আর বাড়ি গিয়ে পড়তে হত না কখনো।

অদ্ভুত স্বচ্ছ, স্পষ্ট, যুক্তিবাদী আর আধুনিকমনস্ক ছিল স্যারের পড়ানোর পদ্ধতি। ওঁর ক্লাস মানেই চিরকাল মনে থাকার মতো এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

ক্লাসের মধ্যেই আর. এস. যা জানেন এবং যা জানেন না, দুই-ই অকপটে সোচ্চার কণ্ঠে বুক ফুলিয়ে বলতেন। কোথাও কোনো উপর-চালাকি ছিল না তাঁর। এতো সাহসী আর অকৃত্রিম মানুষ আমি জীবনে কম দেখেছি।

পড়া না পারলে ক্লাসের মধ্যে আর. এস. আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়তেন। কী মুখ রে বাবা! তাঁর ভয়ঙ্কর রাগ দুর্বাসাকেও হার মানায়। অসম্ভব মেজাজী ছিলেন মানুষটা।

আবার পড়া পারলে, ভালো উত্তর দিলে ভেতর থেকে যে কী খুশি হতেন তিনি! তখন মানুষটা প্রশংসা করতেন। প্রাণ খুলে। তাতে আমাদের পড়াশোনার উৎসাহ-আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

বকাঝকাতেও যেমন, প্রশংসাতেও তেমনি, সব তাতেই আর. এস. ওভার বাউন্ডারি মারতেন। আমাদের ক্লাসের জয় বলতো, রবীন্দ্রনাথ যা লেখেন, তাই-ই কবিতা হয়ে যায়; আর স্যার যাই পড়ান, তাই ফাটাফাটি লাগে।

লোকটাকে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে, কখনো কাউকে নেগেটিভ উত্তর শুনতে হত না। গম্ভীর মুখেও দাঁত বার করে এক গাল হেসে বলতেন, ফার্স্ট ক্লাস। নিজের সাজানো দাঁত আর চোখ নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন লোকটা।

ভয়ঙ্কর অহংকারীও ছিলেন আর. এস.। অথচ সেই তিনিই ক্লাসে আমাদের সহজ করে দিতেন কী অনায়াস দক্ষতায়! প্রথম দিনে আমরা পড়া না পারলে স্যার বলতেন,

— লজ্জা কীসের? তোমাদের বয়সে আমি তোমাদের থেকে ঢের ঢের কম জানতাম।

একদিকে যমদূতের মতো ভয়ংকর রাগী। অন্যদিকে শিশুর মতো সারল্যে ভরা দরদি মানুষটাকে একান্ত আপনজন বলেই মনে হত আমাদের। যে কোনো সমস্যায় আর. এস-কে ফোন করলে, সমাধানের পাওয়া যেত। তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্লাসের রাগ-টাগ আদৌ নয়; ঝরে পড়তো সহানুভূতি আর সমবেদনা।

আর. এস.-কে যত ভয়ই আমরা পাই না কেন, বিপদে-আপদে সেই তিনিই আমাদের শেষ ও একমাত্র বল-ভরসা ছিলেন। পায়েল মজা করে বলত,

'শীত গ্রীষ্ম বরষা
আর. এস.-ই ভরসা।'

আর. এস. প্রথমদিকের ক্লাসে বলতেন,

— এক পিস বাচ্চাও যদি পড়া বুঝতে না পারো, তাহলে দোষ তার নয়; সে অযোগ্যতা আমারই। নির্ভয়ে আবার জিজ্ঞাসা করবে, আমি বুঝিয়ে দেব। দেবই।

— অ্যান্টেনা তোমার যত ঝিরঝিরে আর খারাপই হোক, আমি যেটা পড়াব, তা তোমাদের অ্যান্টেনা রিসিভ করবেই। তুমি-আমি বাঙালি। ভাষা, বিষয় সব বাংলা। না বুঝতে পারার তো কোনো কারণ নেই।

— সাবাস গুরু। এমন উৎসাহ, প্রেরণা, এমন জ্যান্ত ক্লাস; আমরা জীবনে আর কোথাও পাই নি। উনি বলতেন,

— মরা মাছের মতো চোখ করে আমার ক্লাসে কেউ চুপচাপ বসে থাকবে না। সকলের চোখ যেন কথা বলে।

— মরা ক্লাস নয়, আমি চাই জ্যান্ত ক্লাস। মোটামুটি নয়, চাই সুন্দর উত্তর।

— আমি গুরু মাদুর পাতি না। মানে, বাড়িতে প্রাইভেট টিউশন করি না। বুকের রক্ত দিয়ে পরিশ্রম করে ক্লাসেই পড়াবো; পরিবর্তে তোমাদেরও বস্ আমার ক্লাসে পড়াশোনা করেই ঢুকতে হবে। পড়া-টড়া না করে এসে, এই ক্লাসে কোনো চালাকি চলবে না গুরু।

আমাদের কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে, পড়া না করে আর. এস.-এর ক্লাসে ঢুকবো? তবু একবার পড়া না পারায় আমাদের থার্ড ইয়ারের ২৭ জনকে উনি ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

— দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো।

আমাদের ক্লাসের অমিত কাঁচুমাচু হয়ে কী একটা বলতে গিয়েছিল —

— না ভাই, আমি বাকি ১০/১২ জনকে নিয়েই পড়াবো। আমাদের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বলেছিলেন,

— তোমরা ভাই লেডিস কমনরুমে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও। ছাত্রছাত্রী সবাই আর. এস. এর কাছে হয় 'বাচ্চা', নয় 'ভাই'।

ছাত্রছাত্রীদের নাম-টাম জানাজানির বালাই নেই। কী অহংকার রে বাবা! দড়াম করে লাথি মেরে দরজা খুলে হাতের ভঙ্গিমায় আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখাতেন।

সেই ক্লাসে আর বসে থাকে কার সাধ্য?

বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম আর. এস. তখনও গজগজ করছেন,

— যে গরু দুধ দেয়, তার চাট তো খেতে হবে ভাই। কপাল জোরে সেদিন সেই ২৭-এর মধ্যে আমি ছিলাম না।

একবার ঠিক হ'ল আমাদের বিভাগ থেকে 'আগন্তুক' দেখতে যাওয়া হবে। সেটা ১৯৯২ সালের কথা। আমরা তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সত্যজিতের 'আগন্তুক' সবে

রিলিজ করেছে। বিভাগীয় টিচাররা সবাই যাবেন আমাদের নিয়ে। বন্ধুদের মধ্যে তা নিয়ে সে কী হৈ-চৈ। হুড়োহুড়ি। সবাই সিনেমা হলে আর. এস.-এর পাশে বসতে চায়।

সেই মারাত্মক কমপিটিশন দেখে মনে মনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। আমি তাতে যোগ দিই নি। ইচ্ছে ছিল না স্যারের পাশে বসার; তা মোটেও নয়। আসলে সেই ভয়ঙ্কর কমপিটিশনে আমার মতো শান্ত স্বভাবের মেয়ের পক্ষে অংশ নেওয়া খুবই টাফ ছিল। তাই সরে দাঁড়িয়েছিলাম।

আমি শুধু ভাবছিলাম, আর. এস.-এর পাশে দু'জন বসতে পারে। বড়োজোর সামনে পিছনে আরও দু'জন। সব সুদ্ধ চার জনের বেশি তো স্যারের কাছাকাছি বসতে পারবে না। অথচ অনার্সে আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট চল্লিশ। যাই হোক, টিচারদের মধ্যে একমাত্র আর. এস.-ই সেদিন আসেন নি।

টিচার্স ডে। আর. এস. অসুস্থ, আসতে পারবেন না; আমরা তা জানতাম না। স্যারের জন্য ক্রমাগত লেট করছি। অন্য টিচাররা চটে যাচ্ছেন। স্বাভাবিক। তারপর আমাদের বন্ধু সুমিতা ফোন করে জানতে পারলো, স্যার অসুস্থ।

সেবার থার্ড ইয়ারের আমরা সবাই খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। টিচারদের জন্য অনেক ভেবেচিন্তে যে ক'টা গেম তৈরি করে এনেছিলাম আমরা, সবগুলোই আর. এস. -কে মনে রেখে। অথচ উনি এলেন না।

ক্লাসে পড়ানো, ঘড়ি মিলিয়ে আসা-যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দায়িত্ব নিয়ে সিলেবাস কমপ্লিট করা, পরীক্ষার ডিউটি, খাতা দেখা; মোটের উপর পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে আর. এস. অসম্ভব রকমের পানচুয়াল। অথচ সেই তিনিই এলেন না!

কী জানি, হয়তো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিজের প্রবল জনপ্রিয়তার কথা জানতেন বলে ইচ্ছে করেই দর নিতে আসেন নি। কিন্তু মানুষটা এমনিতে যথেষ্ট সাদাসিধে। দেখানোপনা কোনো ব্যাপার-স্যাপার তাঁর স্বভাবেই ছিল না। আর তা ছিল না বলে যেখানে-সেখানে যখন তখন দুম্ করে যথেষ্ট অপ্রিয় সত্য বলে বসতেন।

সরল, সাদা-সাপ্টা, একটু একগুঁয়ে টাইপের মানুষ ছিলেন তিনি। সব তাতে, সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ করা চাই-ই-চাই।

ফলে ওঁর শত্রুর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। সব জেনেশুনেও লোকটা সেই একরোখা স্বভাব একটুও বদলান নি কখনো। সেজন্য অনেক সময় অনেক বিপদেও পড়েছেন আর. এস.।

আমাদের বেলাতেই আর. এস. পিকনিকে এলেন না। সিনেমায় গেলেন না। টিচার্স-ডে-তেও এলেন না। অথচ সিনিয়রদের মুখে শুনেছি, তিনি আগে-আগে এসব দিনে এসেছেন। ক্লাসের মতোই জমিয়ে দিয়েছেন। কী জানি, হয়তো অন্যদের সঙ্গে কিছু হয়েছিল। যা সেন্টিমেন্টাল আর. এস.! আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ।

আমাদের প্রতি আর. এস.-এর যাতে একটু দৃষ্টি পড়ে, তার জন্য কত অভিনয়,